হামহাম ট্রেকিং (ভয়ংকর ভার্সন) প্রতিবেদন ২০১৬

ঝর্ণার নামঃ হামহাম

রেঞ্জঃ কুরমা বন বিট, রাজকান্দি রিজার্ভ ফরেস্ট

কো-অর্ডিনেটসঃ Latitude: N 21° 56′ 59.93″ , Longitude: E 92° 30′ 52.14″

লোকেশনঃ কমলগঞ্জ উপজেলা, মৌলভীবাজার , বাংলাদেশ।

একটিভিটি টাইপঃ ট্রেকিং ও ক্লাইম্বিং

এক্সপিডিশনঃ সামার ক্যাম্প: জয়েন্ট ভেঞ্চার ২০১৬

তারিখঃ ২৩/০৩/২০১৬ থেকে ২৬/০৩/২০১৬

আয়োজকঃ Altitude - outdoor activities

প্রতিবেদন লিখনঃ নীরব মাহমুদ

লেখকের যোগাযোগ তথ্যঃ Email: nmahmudcp@gmail.com, Website: http://blog.codespuzzle.com

সূচীপত্রঃ

ক্রমিক	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
০১	ভূমিকা	৩
০২	যাত্রার পথ এবার ঝর্ণার খোঁজে	”
০৩	বাজেট বিড়ম্বনা	৪
০৪	শ্রীমঙ্গলে অমঙ্গল এবং একটি বিলম্বিত সকাল	৫
০৫	ট্রিপ ইনটু দ্যা টানেল অফ হ্যাভেন	৬
০৬	শতবছরের পুরোনো জনপদে আমার পদচিহ্ন	”
০৭	সঞ্জয়দার ক্যাম্পবাড়ি	৭
০৮	ট্রেইলের আরম্ভ	৮
৯	ঝিরিতে সন্ধ্যায় ঝমঝম এবং পথভোলার সাথে দেখা	৯
১০	জলকণার মেঘ ছুঁয়ে সর্পিল ট্রেইলের শেষ	”
১১	ক্ষ্যাপাটে হামহাম	১০
১২	হড়কাবানের তেলেসমাতি	১১
১৩	রাতের ট্রেইলে ঘুটঘটে অন্ধকার এবং আমাদের সংগ্রাম	১২
১৪	শেষের যাত্রীর প্রত্যাবর্তন ও কুয়োর শীতলজলে অবগাহন	১৩
১৫	ক্যাম্পবাড়ির উপভোগ্য ভোর	১৪
১৬	ঝিঁঝির শব্দে ক্লাইম্বিং	”
১৭	আকাশভাঙা বৃষ্টির সন্ধ্যায় আমাদের ক্যারাভান	১৫
১৮	এনার রোলার কোস্টার	১৬
১৯	নগরীর জেড়ে উঠা ও প্যাভিলিয়নের ডাক	১৭
১৮	ম্যাপে হামহাম, খরচ এবং যাতায়াত রুট	১৮
২০	টিম মেম্বার	১৯
২১	ছবি	২০-২১
২২	কৃতজ্ঞতা ও পরিশিষ্ট	২২

ভূমিকা

হাম হাম কিংবা হামহাম বা চিতা ঝর্ণা, বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রাজকান্দি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গভীরে কুরমা বন বিট এলাকায় অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক জলপ্রপাত বা ঝরণা। জলপ্রপাতটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দের শেষাংশে পর্যটন গাইড শ্যামল দেববর্মার সাথে দুর্গম জঙ্গলে ঘোরা একদল পর্যটক আবিষ্কার করেন।[*তথ্যসূত্র প্রয়োজন*] দুর্গম গভীর জঙ্গলে এই ঝরণাটি ১৩৫ , মতান্তরে ১৪৭ কিংবা ১৬০ ফুট উঁচু, যেখানে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু ঝরণা হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃত মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের উচ্চতা *[১২ অক্টোবর ১৯৯৯-এর হিসাব অনুযায়ী*] ১৬২ ফুট। তবে ঝরণার উচ্চতা বিষয়ে কোনো প্রতিষ্ঠিত কিংবা পরীক্ষিত মত নেই। সবই পর্যটকদের অনুমান। তবে গবেষকরা মত প্রকাশ করেন যে, এর ব্যপ্তি, মাধবকুণ্ডের ব্যাপ্তির প্রায় তিনগুণ বড়।

হাম হাম ঝরণায় এ পর্যন্ত (*নভেম্বর ২০১১*) গবেষকদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযান পরিচালিত হয় নি। সাধারণ পর্যটকেরা ঝরণাটির নামকরণ সম্পর্কে তাই বিভিন্ন অভিমত দিয়ে থাকেন। জনশ্রুতি আছে যে একসময় নাকি এখানে পরীরা গোসল করতো। তাই কেউ কেউ ঝরণার সাথে গোসলের সম্পর্ক করে "হাম্মাম" (গোসলখানা) শব্দটি থেকে "হাম হাম" হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ মনে করেন, সিলেটি উপভাষায় "আ-ম আ-ম" বলে বোঝানো হয় পানির তীব্র শব্দ, আর ঝরণা যেহেতু সেরকমই শব্দ করে, তাই সেখান থেকেই শহুরে পর্যটকদের ভাষান্তরে তা "হাম হাম" হিসেবে প্রসিদ্ধি পায়। তবে স্থানীয়দের কাছে এটি "চিতা ঝর্ণা" হিসেবে পরিচিত, কেননা একসময় এজঙ্গলে নাকি চিতাবাঘ পাওয়া যেত।

কুরমা বনবিটের পাহাড়ের পশ্চিমদিকে চাম্পারায় চা বাগান, পূর্ব-দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত। ঢাকা থেকে প্রায় ২৬০ কিমি. এবং কমলগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৩০কিমি. দক্ষিন-পূর্বদিকে অবস্থিত। জলপ্রপাতের মাত্র ২০০ ফুট পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা বলে জানালেন স্থানীয়রা।

যাত্রার পথ এবার ঝর্ণার খোঁজে

এই রিপোর্ট যখন লিখছি, তার কিছুদিন আগে পাহাড় থেকে ফিরেছিলাম চমৎকার একটা ট্রিপ শেষ করে। সেবার প্রথম বান্দরবানে যাই। চমৎকার অভিজ্ঞতা আর অনুবাদঅক্ষম কিছু গল্প সাথে নিয়ে আসার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সৌভাগ্য বলছি এ'জন্য যে, পাহাড়কে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হয়েছিলো আমার, হয়তো সেটা আশির্বাদের মতো। পাহাড়ে ভ্রমণ কিংবা অভিযান চলছে বহুদিন ধরে। আমাদের পরিচিত-অপরিচিত মিলিয়ে

অনেক বড়ো একটা অংশ পাহাড়ে যান। এই অংশের কেউ যান চূড়ার স্পর্শ পেতে। কেউ যান প্রথম বাংলাদেশি হতে। কেউ যান হই-হুল্লোড়ে পাহাড়ি শান্ত পবিত্রতা নষ্ট করতে। অবশ্য, কোনটা নষ্ট করা আর কোনটা সংরক্ষণ করা, সেটা বিচারের সাধ-সাধ্য-সামর্থ্য কোনটাই আমার নেই।

আমি পাহাড়ে যাই পাহাড়কে খুব কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখতে। সহস্র বছর ধরে নীরব দর্শক হয়ে পৃথিবীর পরিবর্তন দেখা এই সুবিশাল অনুষঙ্গগুলোকে আমার সত্যিকারের ধৈর্য্যশীল মনে হয়। বছরের পর বছর ধরে তাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকা অসংখ্য প্রাণের জন্য জোগান দিচ্ছে খাদ্য। দিচ্ছে বসবাসের জায়গা। অজস্র নিভৃতচারী অভিযাত্রীকে দিচ্ছে প্রশান্তি। এই যে এতোকিছু দানের পরেও কোন ক্রেডিট না নেয়ার মহানুভবতা, এটিই আমার কাছে অবাক করার মতো। যাইহোক..। পাহাড়ের পর এবার আমার গন্তব্য দ্রষ্টব্য ছিলো পাহাড়ের কান্নার জল হয়ে ঝরে পড়া ঝর্ণার পথে।

হামহাম কিংবা আমআম শ্রীমঙ্গলের একটি সুপরিচিত ঝর্ণা। আমাদের ইচ্ছা, হামহামের পাদদেশে ক্যাম্পিং করবো। একই সাথে ঝর্ণায় ক্লাইম্বিং। ক্যাম্প এবং ক্লাইম্বিং করতে পেরেছিলাম কিনা, সে গল্প যথাসময়ে লিখেছি। দেখা যাক সামনে কী হয়..!

বাজেট বিড়ম্বনা

যখন অনেকটা ফ্রিতে এই ট্রিপের দাওয়াত পেলাম, তখন আর প্রত্যাখ্যানের দুঃসাহস করি নি। কারণ, ইবনে বতুতার লতা-পাতায় আত্মীয় আমার পকেট আসলে কখন যে ভরা থাকে, সেটা চিন্তার বিষয়। বতুতা তার সময়ে হেঁটে-চলে ভ্রমণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু, এই শতাব্দীতে সেটা প্রায় সম্ভব নয় বললেই চলে। তাই, ভ্রমণে কিছু বাজেট আপনার লাগবেই। অল্টিচ্যুড থেকে শান ভাই যখন জানালেন, প্রায় ফ্রিতে যেতে পারি যদি ইচ্ছা থাকে। কোন কিছু না ভেবেই রাজি আমি। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি, শান ভাই আমাকে সবসময় এই একটা ব্যপারে সাপোর্ট দেন। তার প্রতিষ্ঠান কোন ইভেন্ট আয়োজন করলে, আগ্রহীদের জন্য কিছুটা ছাড় থাকে। সেই সুযোগ আমি বেশ কয়েকবার নিয়েছি। (কিছুটা মার্কেটিং হয়ে গেলো! আসলে কৃতজ্ঞতার জন্য লিখলাম) ।

বাজেটের সমস্যা সমাধানের ফলে আমার আর কোন বাধা থাকলো না। ব্যাগ-ব্যাগেজ, চাল-ডাল-নূন-তেল আর বহু দরকারী কেরোসিনের ক্যান গুছিয়ে এক রাতে আমরা উঠে পড়লাম শ্রীমঙ্গলগামী বাসে। মহাখালি টার্মিনাল থেকে বাস ছাড়লো। পাশের সিটে বান্দরবান ট্রিপের সহযাত্রী সন্দীপ বসেছে। বয়স কম হলেও পাহাড়ি ভুত নামে নিজের পরিচিয় দেয়। কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া থেকে পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ শেষ করে এসেছে । সামনের সিটে মৌসুমী চৌধুরী ও ছন্দা আপু, বান্দরবানে প্রথম পরিচয়। আড্ডা গল্প গান আর ঝাঁকিতে দফারফা হওয়া ঘুমের মধ্য দিয়ে

আমরা পৌঁছে গেলাম শ্রীমঙ্গল। মাঝখানের যাত্রাবিরতি আর ওয়াশরুম পর্ব নিয়মিত রকমের বলেই সেটা নিয়ে সবিস্তার বর্ণনার প্রয়োজন মনে করছি না। শ্রীমঙ্গল শহরটিতে আমার এই প্রথম আসা। আসলে, বিভিন্ন জায়গায়-জেলায়-বিভাগে গেলেও এই প্রথম আমি সিলেটে এসেছি।

শ্রীমঙ্গলে অমঙ্গল এবং একটি বিলম্বিত সকাল

প্রায় ভোরের দিকে আমরা নামলাম শ্রীমঙ্গলে।বৃষ্টিস্নাত নির্জন শহর আমাদের স্বাগত জানালো। যেখানে আমরা থেমেছি, সেটা তিন রাস্তার মোড়। পুরোনো দালানের দোকানপাট আর নতুন সংস্করণের মার্কেট তখনো খোলার সময় হয় নি। লোকজন বলতে হোটেল আর পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের দেখা মিলছে। আমরা ব্যাগ-ব্যাগেজ রাস্তায় রেখে দাঁড়িয়ে আছি নুরুল ভাইয়ের অপেক্ষায়। নুরুল ভাই আমাদের জন্য রিজার্ভ জিপের ড্রাইভার ও মালিক। বাসস্ট্যান্ডে তার এতোক্ষণে হাজির থাকার কথা থাকলেও তার সাথে সাথে তার জিপের দেখা নেই। শ্রীমঙ্গলে নেমেই এই অমঙ্গল আমাদের বিরক্তি লাগছিলো। কিছুক্ষণ পর নিয়াজ মোরশেদ ভাই তার এক বিদেশি বন্ধুসহ আমাদের সাথে যুক্ত হলেন। তারা গতকয়েকদিন এদিকেই ছিলেন। আজকে আমাদের সাথে হামহাম যাচ্ছেন। ছোট গ্রুপের কলেবর আরেকটু বাড়লো।

আমাদের ঘিরে বেশকিছু কুকুরের কৌতুহলী টহল দেখছি দাঁড়িয়ে। ডেবরাহ লুইক নামে আমাদের একজন ভিনদেশি সহযাত্রী তার দেশে অনেক বছর ডগ ট্রেইনার হিসেবে কাজ করেছে। ফলে, কুকুর বাহিনীর সাথে তার বেশ খাতির জমতে দেখা গেলো। কুকুরগুলো আমাদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ডেবরার কাছে ভিড়তে শুরু করেছে ততোক্ষণে। আমরাও বেঁচেছি কিছুটা হাফ ছেড়ে।

একটু পর ঠিক হলো আমরা এখানে নাস্তা করে তারপর রওনা হবো। পাশের হোটেলে নিজেদের পছন্দমতো মেন্যুতে নাস্তা শেষ করতে করতে নুরুল ভাই হাজির। এখানেও বিপত্তি! যে জিপ আসার কথা ছিলো তার পরিবর্তে আরো ছোট আকারের জিপ আমাদের জন্য আনা হয়েছে। এই জিপে আমাদের সবার জায়গা সংকুলান হবে না।

অগত্যা জিপের সাথে কয়েকটা সিএনজি নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। দেখা যাক এই পথ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়!

ট্রিপ ইনটু দ্যা টানেল অফ হ্যাভেন

শহর পার হতেই শুরু হলো চমৎকার রাস্তা। সারি সারি গাছ চারপাশ থেকে ঘিরে আছে সারাটা পথ জুড়ে। যেনো স্বর্গের পথে এগুচ্ছি ক্রমশ। গ্রামের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে হাজারটা বাঁক খেয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের ইঞ্জিনগাড়ি। রোদ আর মেঘে মাখামাখি প্রকৃতিতে শান্ত শীতল বাতাস আমাদের জুড়িয়ে দিচ্ছে। লাউয়াছড়া রিজার্ভ ফরেস্টের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে দেখছিলাম, কী দারুন ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে রেখেছে প্রকৃতি! বিশাল বিশাল নাম না জানা গাছ, বেতগাছের লতানো বিস্তৃতি, পাখিদের কলরব কী চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরী করেছে। সবুজের দমবন্ধকরা সৌন্দর্য্য আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিলো, মানুষ হিসেবে কতোটা ক্ষুদ্র আমরা! সজীব জীবন্ত বনের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাকে মনে হচ্ছিলো দ্যা টানেল অফ হ্যাভেন! যেনো আদিম সময়ে আমরা কিছু মানুষ যাত্রা করেছি জুলভার্ণের রহস্যময় কোন হারানো শহরের দিকে..।

পথে আমরা গাড়িয়ে থামিয়ে মাধবপুর হ্রদে সাময়িক বিরতি নিয়েছি। স্বচ্ছ টলটলে জলে পদ্ম ফুঁটে ছিলো। পরে জেনেছি এগুলো বেগুণী শাপলা, যা এই হ্রদের অন্যতম সিগনেচার অনুষঙ্গ । কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত এই লেক। ন্যাশনাল টি কোম্পানি বা এনটিসির চা বাগানের ১১ নম্বর সেকশনে স্থানীয় নাম পাত্রখলায় মাধবপুর হ্রদের অবস্থান। চা চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাই প্রায় প্রতিটি চা বাগানেই কর্তৃপক্ষ একাধিক জলাধার তৈরী করে। স্থানীয় চা শ্রমিকরা এসব জলাধারকে ডাম্প বলে থাকে। সেই প্রয়োজন থেকেই এনটিসি কর্তৃপক্ষ ১৯৬৫ সালে বাগানের মধ্যস্থিত তিনটি টিলাকে বাঁধ দিয়ে পানি জমিয়ে কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলে মাধবপুর হ্রদ। এই হ্রদটির আয়তন প্রায় ৫০ একর এবং দৈর্ঘ্যে প্রয় ৩ কিমি আর প্রস্থ স্থানভেদে ৫০ হতে ৩০০ মিটার। বেগুনী শাপলা ছাড়াও আছে নীল পদ্ম, টিলার পাশজুড়ে ফুটে থাকা ভাঁট ফুল। এখান থেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের নাম না জানা কোন পাহাড়ি রেঞ্জের দেখা পাওয়া গেলো।

শত বছরের পুরোনো জনপদে আমার পদচিহ্ন

যে এলাকা ধরে চলছিলো আমাদের জিপ, সে এলাকার বেশিরভাগ নামই প্রাচীন সময়ের সাক্ষ্য বহন করছে। ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর, মানুষের অবাক দৃষ্টির আড়ালে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সুপ্রাচীন এক জনপদের চিহ্ন। দোকানের সাইনবোর্ড, মাইলফলকে উৎকীর্ণ নাম থেকে বুঝতে পারছিলাম, এ অঞ্চলে বসতির গোড়াপত্তন হয়েছিলো বহুকাল পূর্বে। কারা এই অঞ্চলে প্রথম এসেছিলো, ইতিহাসে তার দেখা মেলে।

শ্রীমঙ্গলে বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাস। ত্রিপুরা, খাসিয়া, মণিপুরী, সাঁওতাল, গারো, মুরা, খারিয়া, উড়াং। এছাড়া উপজেলার চা বাগানগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবাস রয়েছে। আদিকাল থেকেই বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাথে দৃঢ় সম্প্রীতির বন্ধনে বসবাস করে আসছে সমৃদ্ধ ও বর্ণিল সংস্কৃতির ধারক এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। এসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, জীবনাচার, পোষাকের ভিন্নতাসহ আদিবাসী গ্রাম ও পাড়ার বিচিত্র দৃশ্য আরো কাছ থেকে দেখার ইচ্ছা হচ্ছিলো।

আমি ভাবছিলাম, এই যে আমরা সদলবলে হামহামে যেতে চাইছি। হয়তো আরো আরো অনেকদিন আগে আমাদের মতো অন্যরাও কোন দলবল নিয়ে যাত্রা করেছিলো এই পথে। সেই সময় কেমন ছিলো এই অঞ্চল? কারা শাসণ করতো বিস্তীর্ণ এই এলাকা? যাদের নামে এই অঞ্চলের জনপদগুলোর নাম রাখা হয়েছে, তারা কারা ছিলেন? তারা কি কখনো ভেবেছিলেন, শতবর্ষ পর কেউ একজন তাদের কথা মনে করবে?

এই জনপদে বহুদিন ধরে বসবাস করা বেশিরভাগ আদিবাসী পরিবারেরই নিজেদের ভূমি মালিকানা নেই। নেই পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ। উচ্ছেদ আতংক, নিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক দৈন্য এখানকার মানুষদের জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী। আমাদের গাড়ির দর্শক হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উদোম গায়ের খাসিয়া শিশুটি জানে না, তার ভবিষ্যতের দিনগুলো কেমন হবে। কিংবা, নাকে জমাট পানি নিয়ে উৎসাহী যে সাঁওতাল ছেলেটি রিকশা-টায়ার গাড়ি নিয়ে আমাদের গাড়ির পিছু ছুটছে, তার আগামীকালের বেঁচে থাকার রসদ কীভাবে জোগাড় হবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এই ভাবনা আমাকে লজ্জিত করছিলো। মানুষে মানুষে এই বৈষম্য না থাকলে পৃথিবীটা হয়তো আরো দারুন হতো!

শতবর্ষের প্রাচীন জনপদে আমার পায়ের স্পর্শে আমি যতোটা আনন্দিত হয়ে উঠেছিলাম, তেমন কষ্টও একইসাথে অনুভব করেছি। আরও লজ্জা লেগেছে এটা ভেবে যে, শহরে ফিরে গিয়েই আমি এদের কথা ভুলে যাবো। ব্যস্ত হয়ে পড়বো নিজের জীবন নিয়ে। কী করতে পারি ক্ষুদ্র আমি!

সঞ্জয়দার ক্যাম্পবাড়ি

নানা চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে, গাইড নেয়া- রাস্তার ঝক্কি সামলে আমরা আমাদের সাময়িক আশ্রয়ে পৌঁছে দেখলাম, একচিলতে ছোট্ট উঠান নিয়ে মাটির দেয়াল আর ছনের ছাউনির ঘর সঞ্জয়দার। কলাবন পাড়ার শেষ বসতি সঞ্জয়দার। এখান থেকেই ভ্রমণকারীরা ট্রেইলে নামে। সরল চেহারার খাবারের ব্যবস্থা আছে। আছে এলাকার গাইড নামের কিছু লোকজন। পাওয়া যায় বাশের লাঠি, মিনারেল ওয়াটার, সিগারেট ইত্যাদি।

বাড়ির সামনের উঠানে আমাদের প্রাথমিক ঠাঁই হলো। সাথে করে নেয়া তেরপলের উপর সবার ব্যাগ রেখে আমরা চারপাশের চেয়ার আর বেঞ্চিতে বসলাম। বিশ্রাম নেয়ার সাথে সাথে খাওয়া ও প্রাথমিক ব্রিফিংয়ের জন্য এই বিরতি। সঞ্জয়দার বাড়ি আমাদের জন্য বেসক্যাম্প হিসেবে কাজ করবে।

খাওয়া তৈরী হতে হতে আমাদের জন্য প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া শুরু করলেন টিমলিডার। যেহেতু আমরা ওখানে রাতে থাকবো এবং ঝর্ণায় র্যাপলিং/জুমারিং করবো, সেহেতু কিছু বিষয় আমাদের জানা একান্ত জরুরী ছিলো। সেসব নিয়ে কথা বলতে বলতে খাবার চলে আসলো। ভাত-ভর্তা ডিম-ডালে শেষ করলাম সেদিনের দুপুরের খাওয়া। তারপর কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আমাদের ট্রেইলে বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি শুরু হলো।

ট্রেইলের আরম্ভ

শুরু হলো আমাদের পথচলা। খটখটে রোদ মাথায় করে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। সহজ এবং সাবলিল গতিতে হাঁটছি সবাই। খোশগল্প আর টুকটাক কথাবার্তায় এগিয়ে চলছি। কিছুদূর এগিয়ে বুঝতে পারছিলাম আমরা, সবাই কেমন হাঁপিয়ে পড়ছি। সারারাতের নির্ঘুম জার্নি, তৃপ্তিমতো খাবার না হওয়া সবমিলে আমাদের শরীর কেমন শ্লথ হয়ে আসছিলো। ধীরে ধীরে ক্লান্তি বেড়ে যাচ্ছিলো। প্রয়োজন মতো জিরিয়ে নিয়েই হাঁটছিলাম আমরা।

পানির রিজার্ভ নিজেদের কাছে তেমন ছিলো না। ফলে প্রায়ই অন্যের পানিতে মেটাতে হচ্ছিলো তৃষ্ণা। কোন অজানা কারণে গরম লাগছিলো খুব বেশি। মনে হচ্ছিলো ক্রমশ তেঁতে উঠছে আমাদের ট্রেইল। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। হাঁটছিতো হাঁটছিই..। আমার মনে হচ্ছিলো, এই হাঁটার কখনো শেষ হবে না যেনো..। উঁচু নীচু, চড়াই-উৎড়াই, ঝোপ-জঙ্গল, বাঁশঝাড় পেরিয়ে আমরা পথ চলেছি। চলতে চলতে একসময় আলো কমতে শুরু করলো। আকাশে মেঘ করায় নীচের ট্রেইলে আলোর স্বল্পতা দেখা দিয়েছে ততোক্ষণে। তারপরও আমরা চলতে পারছি নিজেদের অনুমান আর সামনের জনের পদরেখা অনুসরণ করে।

বিকাল নামার সময় হয়ে আসছে। ততোক্ষণে আমরা বুঝতে পারছিলাম, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় খরচ করে ফেলেছি হাঁটা রাস্তায়। সামনে ঝিরিপথ। স্বল্প আলোতে কীভাবে সে রাস্তায় হাঁটবো, বুঝতে পারছিলাম না। তবুও গন্তব্যে পৌঁছতে হবেই..। এর মধ্যেই আমরা মেঘের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম। বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ ততোক্ষণে আমাদের নাকে লাগতে শুরু করেছে। বুঝতে পারছিলাম শীঘ্রই বৃষ্টি নামবে। হাঁটাপথের শেষ হতেই ঝিঁরিপথের শুরু। পথ শেষ হতেই বুঝতে পারলাম, ঝামেলায় পড়েছি আমরা। ঝিঁরিপথের মোড় নিয়েছে দুই দিকে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না সামনে। কোনদিকে আমাদের রাস্তা, সেটা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য আমাদের পক্ষে। হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলাম, আমরা আটকা পড়েছি এই ঘনায়মান অন্ধকার জঙ্গলে। এখন উপায়!

ঝিরিতে সন্ধ্যায় ঝমঝম এবং পথভোলার সাথে দেখা

মেঘে মেঘে অন্ধকার নামছে চারদিকে। সামনের দলটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। আমরা ৩ জন আটকে পড়েছি ঝিরিতে। বুঝতে পারছি না কীভাবে এবং কোনদিকে এগুবো। এমন সময় ঝমঝম করে নামতে শুরু করলো বৃষ্টি। ধীরে ধীরে বাড়ছে জলের মাত্রা। ঝিঁঝিঁর আওয়াজের সাথে বৃষ্টির অপার্থিব শব্দ মিলেমিশে শিহরণ জাগিয়ে তুলছে।

আমরা গভীর মনোযোগে কাঁদাজলে পায়ের ছাঁপ খোঁজার চেষ্টা করছি। মাথার উপরে ঝাকড়ানো ঝুলে পড়া ডাল, বাঁশঝাড় সৃষ্টি করে রেখেছে আড়াল। সবুজ এবং সতেজ একটা টানেলের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছি পথ হারিয়ে ফেলা দলছুট তিন বোকা।

নিজেদের ঘটে যেটুকু বুদ্ধি কিংবা জান্তব অনুভূতি ধরে, সেটা দিয়ে রাস্তা আন্দাজের চেষ্টা চালালাম। ঝিঁরিতে পানির গতিপথ লক্ষ্য করলাম। যেহেতু ঝর্ণার দিকে মানে আপস্ট্রিমে যাবো, সেহেতু যেদিক থেকে পানি আসছে সেদিকেই আমাদের গন্তব্য। সহযাত্রী আদনান ভাইয়ের কাছে থাকা হুইসেল বাজাচ্ছিলেন তিনি। হুইসেলের সাথে পাল্লা দিয়ে ডেকে উঠছিলো কোন বেরসিক কোকিল। অহেতুক জেনেও গলা ফাঁটিয়ে ডাকার চেষ্টা করছিলাম অন্যদের। আবার কখনো চুপচাপ কান পেতে শোনার চেষ্টা করছিলাম কোন পায়ের শব্দ পাওয়া যায় কিনা..। পথভোলার গল্প শুনেছিলাম ছোটবেলায় দাদীর কাছে। মানুষকে রাস্তা ভুল করে অজানা কোন দেশে নিয়ে যায় সে। তখন সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো আসলেই হয়তো পথভোলা নামে কিছু আছে। নাহলে এভাবে পথ হারাবো কেনো আমরা!

এসব কসরতের মাঝেই ডানের ট্রেইল থেকে আসতে দেখছিলাম উজ্জ্বল কাপড় পড়া টিম লিডার শান ভাইকে। আমাদের দেরি থেকে খুঁজতে এসেছেন। ততোক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে ঝমঝম। বাড়ছে ক্রমশ ঝিরির জল, খুব দ্রুত গতিতে। ঝিরির পাথরের চাঙড়, বাঁশের ভগ্নাংশ ইত্যাদি এখন আর দেখা যাচ্ছে না। সামনের জনকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করে এগুচ্ছি আমরা।

জলকণার মেঘ ছুঁয়ে সর্পিল ট্রেইলের শেষ

হাঁটছি তো হাঁটছি। হাঁটার শেষ হচ্ছে না যেনো। হঠাৎ আমরা দেখলাম সামনে অনেকটুকু জায়গায় পাহাড়ের মাথা ঢেকে আছে কুয়াশার মতো মেঘের চাদরে। ভেসে আসছে একটানা ঝমঝম শব্দ। বুঝলাম আমরা খুব কাছে পৌঁছে গেছি ঝর্ণার। এসব হচ্ছে জলকণার সৃষ্ট মেঘ। বৃষ্টির জল পাহাড়ে উন্মাতাল হয়ে নেমে আসে নীচের দিকে। আপারস্ট্রীম থেকে লোয়ারস্ট্রীমে। সেই কারণেই হামহামের গর্জন আমাদের শিহরণ জাগাচ্ছে।

তীব্রবেগে উপর থেকে নেমে আসা জল সারফেস লেভেলের পানিতে আছড়ে পড়ে। তৈরী হয় সহস্র জলকনা। আমাদের চারপাশের বাতাসে মেঘের সূক্ষ্ণ চাদরেরমতো ভেসে বেড়ানো জলবিন্দু অপার্থিব এক দৃশ্য তৈরী করছে। বৃষ্টির জোর কমে গেলেও বাতাস তখনো খ্যাপাটে। আমরা এর মধ্য দিয়েই হাঁটছি। পানি ততোক্ষণে হাঁটু ছাড়িয়ে কোমর ছুয়েছে। শো শো হাওয়ার মাতামাতি আর ঝর্ণার গম্ভীর ঝমাঝম মিলেমিশে অদ্ভূত বিভ্রম তৈরী করছিলো। নেশার ঘোর যেনো আমাদের সম্মোহিত করে রেখেছে। আমরা শুধু সামনে যাচ্ছি। হামহাম দেখবো বলে।

আঁকাবাকা ট্রেইলের শেষ মাথায় চলে এসেছি। টিম লিডার জানালেন। ততোক্ষণে শব্দের ভয়াবহতা আরো বেড়েছে। আমি বুঝতে পারছি, আপনি একজন পাঠক হিসেবে যখন এই লেখা পড়ছেন, তখন ভাবছেন ধূর! হামহাম সাধারণ এবং সহজ একটা ঝর্ণা। এখানে এতো ভয়াবহতা আসবে কোত্থেকে! আমিও তেমনই ভাবছিলাম।

ভরা বর্ষায় আর ঝুম বৃষ্টিতে এর অবস্থা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। আমাদের সামনে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক। তারপরই আমরা পৌঁছে যাবো গন্তব্যে।

ক্ষ্যাপাটে হামহাম

বাঁকে পার হতেই দূর থেকে দেখা মিললো আমাদের আকাংখিত হামহাম ঝর্ণার। শত শত টন পানি পাক খেয়ে নেমে আসছে নীচের দিকে। মাটির মিশ্রিত ঘোলাটে রঙ তার। শো শো শব্দ আর পানির ছিটকে আসা ফোয়ারায় ভেসে যাচ্ছে আশপাশ। যেখানে আমাদের ক্যাম্প করার কথা, সে জায়গায় পানি উঠে গেছে। বড়ো বড়ো মরা গাছের গুড়ি, বাঁশ, ডাল-পালা সব ধুয়ে মুছে নেমে আসছে পানির তোড়ে। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যাওয়ার আগে হামহামের যে ছবি দেখেছি, যে জার্ণির কথা শুনেছি, তার সাথে কোন মিল নেই এর। উন্মাতাল জলের সবেগে ধেয়ে আসা এবং ঝিরি ধরে তার ছুটে চলার তীব্রতা দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি আমরা সবাই। ঝর্ণার সামনে কিছুটা দূরে দাঁড়ানো অস্থায়ী দোকানঘরের চালার নীচে আমরা সবাই দাঁড়িয়েছি। সাথে থাকা বড়ো তেরপল দিয়ে ঘরের চারপাশে বেড়ার মতো করে দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। ঠান্ডায় কাপন ধরে গেছে সবার।

কী করবো এখন সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। কেউ বলছে থেকে যাবো এখানেই। কারণ, ফিরতে ফিরতে আলো থাকবে না। তখন যাওয়া সম্ভব হবে না। আবার কেউ বলছে, যে করে হোক ফিরে যেতেই হবে। এই অবস্থায় এখানে ক্যাম্প সম্ভব না। সবার শরীর রঙ পাল্টে ফেলেছে। কেউ সাদাটে আবার কেউ নীলচে। কনকনে বাতাস সুঁইয়ের মতো বিঁধছে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হলো, আমরা ফিরবো। এখানে ক্লাইম্বিংতো পরের কথা, রাতে

থাকার মতো অবস্থাও নেই। আর যদি গোয়ার্তুমি করে থেকেই যাই, তাহলে ঠান্ডায় বড়ো রকমের ঝামেলায় পড়বো।

দাঁড়ানো থাকতে থাকতেই আমরা টুকটাক কিছু খেয়ে নিলাম শুকনো খাবার। তারপর তেরপল গুছিয়ে সবার ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট, মোবাইল, ক্যামেরা টিমলিডারের ব্যাগে দিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। কিছুদূর হেঁটেই আমাদের আবার নামতে হলো ঝিরিতে। পানির গড় উচ্চতা ততোক্ষণে কোমর ছাড়িয়েছে। আন্দাজে পা ফেলে সারিবদ্ধভাবে পথ চলছি আমরা। স্রোতের তোড় অসম্ভব তীব্র। তবুও যেতে হবে। দেরী করার সুযোগ নেই। কারণ, আমর সবাই বুঝতে পারছিলাম, রাতের অন্ধকারে এই ঝিরিতে হাঁটা পাগলামি হবে। তাই, বিকাশের শেষ আলোটুকু সম্বল করে ঝিরি পাড় হওয়ার চেষ্টা করছি।

হড়কাবানের তেলেসমাতি

হড়কাবানের তোড়ে আমাদের এগুনো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। আমার এ্যাডভেঞ্চার ট্রাভেলিংয়ের অভিজ্ঞতা খুবই কম। হড়কাবানের ভয়াবহ রূপ এর আগে কখনো এভাবে দেখি নি। কী ভীষণ টান স্রোতের! ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব। একজনের হাতে অন্যজন ধরে আছি। ছোটছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে পাড় হচ্ছি ঝিরি। একপর্যায়ে আর হাঁটা যাচ্ছিলো না। পানির উচ্চতা বেড়েছে। কোথাও কোথাও বুকসমান গভীরতা।

তখন আমাদের সাথে থাকা ক্লাইম্বিংয়ের রোপগুলো আমরা বের করে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। বিদেশি সহযাত্রী রবার্ট এই কাজে বেশ পারদর্শিতা দেখালো। ঝিরির একপ্রান্তে রবার্ট অন্যপ্রান্তে গাছে রোপ বেঁধে এপার ওপাড় করে এগুলাম। টিমলিডার, মনির, শোয়াইব ভাই বেশ সাহায্যে আসলো। কখনো আবার একসারিতে রোপ ধরে সবাই হাঁটলাম। টিম লিডারের ক্রমাগত সাহস জোগানো, তাগাদা দেয়া ও তদারকি আমাদের কষ্ট কিছুটা লাগব করেছিলো।

হড়কাবান তখনো চলছে। আমরা কিছুটা উঁচু অংশে চলে এসেছি। এমন সময় আমাদের এজনের হাত থেকে পাতিলসহ একটা রেশন ব্যাগ হাতছাড়া হয়ে গেলো। চোখের পলকে দেখলাম ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাগ। সে কী তীব্র গতি! এমন করে অসংখ্যবার হোচট খেয়ে, পিছলে গিয়ে, ব্যাথা পেয়ে আমরা উঠে আসলাম ঝিরি থেকে।

সবাই ভয়ানক ক্লান্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম অগোছালো ভাবে। বিশ্রাম নিতে গিয়েই আমরা টের পেলাম আমাদের চারপাশে জোঁকের আনাগোনা যথেষ্ট পরিমানে। আর দেরি করা চলে না।

রাতের ট্রেইলে ঘুটঘটে অন্ধকার এবং আমাদের সংগ্রাম

যখন ট্রেইলে উঠলাম, ততোক্ষণে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এসেছে ট্রেইলে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন শুধু হেঁটে চলার তাড়না। যেতে হবে দূরে..। ব্যাগ থেকে চার্জ লাইট, টর্চ, হেডল্যাম্প ইত্যাদি বের করে নিয়েছি। ডেবরার কল্যানে আরো কিছু ওয়ানটাইম এলইডি পেলাম। সেসব নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শুরু হলো আমাদের যাত্রা। বৃষ্টিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে ট্রেইলে মাটি। এর মধ্যে অন্ধকারে হেঁটে চলেছি আমরা। এই বিশাল ট্রিমের বেশিরভাগই আনাড়ি। ফলে, ধীর হচ্ছে গতি। অসংখ্যবার থামতে হচ্ছে। জোঁকের উপদ্রব বেড়েছে। মাঝে মাঝেই শরীরের স্পর্শকাতর অংশে তাদের উপস্থিতির কারণে থেমে শংকামুক্ত হতে হচ্ছে।

আমি মনির আদনান ভাই ছন্দা আপু আর মৌসুমী। আমরা ক'জন একেবারে শেষের দিকে। আমার আর মনিরের দায়িত্ব ছিলো পেছনের সবকিছু দেখে আগানোর। কেউ রয়ে গেলো কিনা, কোন ব্যাগব্যাগেজ পড়ে থাকলো কিনা, সেসব দেখে নিয়ে আসা এবং তারপর সবার সাথে এগিয়ে যাওয়া।

হেঁটে চলেছি আমরা অনবরত। মাথার উপরের বড়ো বড়ো গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝেই উঁকি দিচ্ছে ভোল্টেজ হারানো একফাঁলি চাঁদ। কাঁদায় পিচ্ছিল পথ ধরে আমরা চলছি অনন্তযাত্রায়। হাঁটছিতো হাঁটছিই। একসময় মনে হচ্ছিলো আমরা যেনো কোন প্যারাডক্সে আটকে গেছি। এর মাঝে উঁচু নিচু পথে উঠানামার প্যারা, পিছলে ছ্যাচড়ে একাকার অবস্থা আমাদের। খুব পিচ্ছিল ঢালুপথে নামতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছিলো। সেসব যায়গা আমি নতুন কেনা ট্রাভেলার্স প্যান্টের উপর ভরসা রেখে স্লিপারের মতো ছ্যাচড়ে নেমে পাড় হচ্ছি। কখনো মনির ছন্দা আপুকে সাহায্য করছে। কখনো আদনান ভাই মৌসুমীকে। আমার পিঠে এবং হাতে ব্যাগ। কখনো ছন্দা আপু মনিরকে কিংবা মৌসুমীকে ধরছে। সামলাচ্ছে। সাহায্য করছে। ছন্দা আপুর গতি কিছুটা ধীর হলেও অসম্ভব সাহসী ও ধৈর্যের অধিকারী তিনি। কখনো থেমে যাওয়ার চিন্তা মাথায়ই আনছেন না।

আমি ভয় পাচ্ছি, আমাদের কেউ যদি ডেডস্টপ/একেবারে থেমে যায়, তখন কী অবস্থা হবে! আমরা আমাদের ব্যাগেজ হিসাব করে দেখলাম, খুব বাধ্য হলে আমরা কোনরকম কাটিয়ে দিতে পারবো রাত। কিন্তু, সেক্ষেত্রে অন্যরা কী করবে আমরা না পৌঁছলে! এইসব ভাবনা, ট্রেইলে কিছু সহযাত্রীর বিরক্তিকর ভূমিকা ইত্যাদি শেষ করে একসময় আমরা দেখলাম আমাদের ট্রেইল শেষ। কিন্তু, কলাবন পাড়ার কোন চিহ্ন নেই!!!

আজব ব্যাপারে আমরা সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম! এখন কী হবে! আমাদের কাছে কোন ফোন নেই। যোগাযোগের কোন উপায় জানা নেই। লোকালয় থেকে ঠিক কতোটা দূরে আছি আমরা সেটা বুঝার জন্য দিগন্তে আলোর সন্ধানে তাকাচ্ছি। একটু এগুতেই দেখলাম বাঁশের মাচাংয়ের দু'টি গোলাঘর। বুঝতে পারলাম আশেপাশে মানুষ আছে। গোলাঘরে বসার জন্য যাওয়ার পথে কিছুটা দূরে দেখলাম ইলেক্ট্রিসিটির আলো। ১০০ পাওয়ারের লাল আলোর বাল্ব যে কখনো এতোটা স্বস্তি দিতে পারে, এটা এখন ভাবতেও অবাক লাগে!

মানুষের হাঁকডাক শুনে বুঝলাম আমাদের ডাকছে। আমার হাতে তখন প্রমাণসাইজের একটা দা' আছে। ট্রেকিং ও ক্যাম্পিংয়ে লাগতে পারে ভেবে সাথে নেয়া হয়েছিলো। প্রথম দর্শনে এটা দেখলে লোকগুলোর অনুভূতি কী হবে ভাবতেই দা' টাকে কাপড়ের ভাঁজে আড়াল করে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। গিয়ে বুঝলাম উনারা স্থানীয় ফরেস্ট গার্ড/নিরাপত্তারক্ষী। আমরা পথ হারিয়ে এদিকে চলে এসেছি এবং সঞ্জয়দার বাড়ি কলাবন পাড়ায় যাবো জানাতেই রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। জল স্যাঁতস্যাঁতে ঘাসজমির আইল ধরে হেঁটে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম কলাবনপাড়ার মুখে। টর্চ, হ্যারিকেনের আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। আমাদের টিমের কয়েকজন উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলো আমাদের জন্য। পরিচিত মুখগুলো দেখে আমার প্রথমবারের মতো মনে হলো, দুঃস্বপ্নের ট্রেইল জার্ণি অবশেষে শেষ হলো তাহলে!

শেষের যাত্রীর প্রত্যাবর্তন ও কুয়োর শীতলজলে অবগাহন

ট্রেইলের শেষ যাত্রীর দল হিসেবে বের হয়ে আসলাম আমরা ক'জন। সঞ্জয়দার বাড়িতে ঢুকে দেখি শরণার্থী ক্যাম্পের চেহারা পেয়েছে। কাদামাটি ভিজে কাপড় নিয়ে কেউ শুয়ে আছে। কেউ বসে আছে এখানে ওখানে। ক্লান্ত কেউ আবার মাটিতে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ছে। আমরা ব্যাগব্যাগেজ রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিলাম। তারপর মেয়েরা তাদের জন্য নির্ধারিত সঞ্জয়দার প্রতিবেশির আরেক ঘরে চলে গেলো গোসল এবং বিশ্রামের জন্য। আমরা প্রথমে টর্চের আলোয় লজ্জা পাশে রেখে, একজন আরেকজনের শরীরে জোঁক তল্লাশী চালালাম। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে গোসলের জন্য গেলাম গ্রামের একটি কুয়োতে। একজন আন্তরিক গ্রামবাসীর সহায়তায় কুয়োর শীতলজলে সেরে নিলাম শান্তির স্নান।

বাড়িতে ফিরে একফাঁকে কোনরকম কিছু খেয়ে শোয়ার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ভাবছি। আমাদের তাবুতে রাত কাটানোর কথা থাকলেও বৃষ্টি ও কাঁদার কারণে বাইরে টেন্ট পিচ করা যায় নি। সঞ্জয়দা নিজেদের একমাত্র রুমটি আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে তারা চলে গেলেন বারান্দায়। রুমের মাটিতে যে যার মতো বিছানা পেতে কোনরকমে পিঠ ঠেকিয়েই ঘুম দিয়েছে সবাই। অন্যরা আশ্রয় নিয়েছে বারান্দায়।

শীত লাগলেও প্রচন্ড ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমে ঢলে পড়েছি, বুঝতে পারি নি। মরার মতো ঘুম শেষে যখন চেতনা ফিরে পেলাম, তখন বাইরে ঝকঝকে সকাল। টুকটাক কথাবার্তার শব্দ আসছে। উঠে পড়লাম বৃষ্টি নেই দেখে। দরজা থেকে বের হতেই মনে হলো, আহ! কী চমৎকার এই বেঁচে থাকা!

ক্যাম্পবাড়ির উপভোগ্য ভোর

অবসন্ন এবং ভয়ংকর রাতের পর ভোর কেমন উপভোগ্য হয়, সেটা বুঝতে পারার জন্য সেদিনের ভোরটাকে বারবার দরকার হবে আমাদের। চারপাশে ঝকঝকে আলো। আকাশ পরিষ্কার। মৃদু হাওয়া বইছে থেকে থেকে। বাড়ির পাশঘেষে বয়ে যাওয়া ছোট্ট ঝিরির শব্দ পাচ্ছি কানে। গতরাতের বিভীষিকার কোন চিহ্নও নেই কোথাও। একজন দু'জন করে ঘুম ভেঙে বাইরে আসছে সহযাত্রীরা। আমি বসে আছি একটা কাঠের বেঞ্চিতে। ঝরঝরে শরীর এবং বিশ্রাম পেয়ে শান্ত মন চুপচাপ উপভোগ করছে সকালের স্নিগ্ধতা।

একটু পর সঞ্জয়দা এসে জানিয়ে গেলেন, খিচুড়ি রেডি হয়ে গেছে। আমরা চাইলে নাস্তা করে নিতে পারি। সবাই ততোক্ষণে উঠে পড়েছে। সাথে নিয়ে যাওয়া আচাড়ের মিনিপ্যাক দিয়ে খিচুড়ি। গতরাতের আধপেটা খাওয়া ক্ষুধার্ত আমরা প্রায় সবাই দারুন তৃপ্তি নিয়ে শেষ করলাম নাস্তা। সুখী মানুষ মনে হচ্ছিলো নিজেকে। নাস্তার পর লম্বা বিশ্রাম শেষে আমাদের কাজ এখন কী হবে, সেটা নিয়ে ভাবছিলাম। টিম লিডার এসে জানিয়ে গেলেন, আমাদের ক্লাইম্বিং পর্বটি কাছের বনে অনুষ্ঠিত হবে।

ঝিঁঝিঁর শব্দে ক্লাইম্বিং

পরদিন দুপুরের আগে আমাদের শুরু হলো ক্লাইম্বিং। অনেকটা সময় লাগিয়ে একটি লম্বাটে বৃহৎ গাছ বাছাই ও বহুৎ কায়দা করে তাতে রোপ ফিক্সড করা হলো। ক্লাইম্বিং এর বেসিক কিছু বিষয় আমাদের জানানো হলো। আগে থেকে কিছুটা জানা থাকায় অনেক সহজ লাগলো। তারপর আমরা ফিক্সড রোপে জুমারিং/এসেন্ডিং-ডিসেন্ডিং করলাম। বেশুমার ছবি তোলা হলো। আড্ডা, গল্প, বিশ্রাম, ঝগড়া, ক্ষ্যাপনো সবই হলো।

বনের স্বাভাবিক শব্দের কোলাহল আমাকে খুব স্বস্তি দিচ্ছিলো। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিরিতে পানির বয়ে চলার ছন্দময় আওয়াজ ও এর সাথে সাথে, নাম না জানা পাখির ডাকাডাকি, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, পাতার শব্দে মন

অবশ হয়ে আসছিলো। কোথায় আমাদের জঞ্জালে ভরা সারাক্ষণে আওয়াজে তিতিবিরক্ত ঢাকা শহর! আর কোথায় এই বনের একপ্রান্তের শান্ত নীরবতা! জীবনের অংশগুলো কতোরকম অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে থাকে!

ক্লান্ত হয়ে দুপুরের দিকে আমরা ফিরলাম আমাদের ক্যাম্পবাড়িতে। ঝিরির জলে কাঠের বাঁধানো ঘাটে আমরা পর্যায়ক্রমে গোসল করে নিলাম। তারপর খুব সাধারণ সেদ্ধডিমের তরকারী আর ডালে খাওয়া শেষ করে বিশ্রাম। একটু পরই আমরা রওনা হবো ফিরতি পথে। সে প্রস্তুতি নিতে থাকলাম আমরা। আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন দেখে জিপের ছাদে আমাদের ব্যাগব্যাগেজ রেখে সবেধন নীলমনি বিশাল তেরপলে ঢেকে দিলাম সব। সঞ্জয়দার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ছি।

আমার মনে পড়ছিলো এই ক্যাম্পবাড়ির খুব সাধারণ মানুষগুলোর আন্তরিকতা। দারিদ্রসীমার এতো এতো নীচে তাদের বাস যে, তাদের জন্য কোন সীমা বলে কিছু নেই। তারপরও প্রকৃতি তাদের সহজ এবং স্বাভাবিক উদারতা দিয়েছে। আমি যাকে আন্তরিকতা বলছি, সেটা তাদের কাছে স্বাভাবিক। এই যে মানোজাগতিক ফারাক, এই সতেজ উদারতা, এই ঐশ্বর্য আমি কোথায় পাই!

আকাশভাঙা বৃষ্টির সন্ধ্যায় আমাদের ক্যারাভান

ফেরার পথ যখন ধরেছি আমরা, তখন সন্ধ্যা নামছে। পাশাপাশি নামছিলো ঝুম বৃষ্টি। এর মধ্য দিয়ে ফোর হুইল ড্রাইভের গাড়িতে শুরু হলো আমাদের যাত্রা। যাবার সময় জিপের পাশাপাশি সিএনজি ছিলো। কিন্তু, ফেরার পথে সিএনজি পাওয়া যায় নি। তাই পথে একজায়গায় আমাদের অস্থায়ী বিশ্রামের সুযোগ মিললো। অন্য আরেকটি গাড়ি খোঁজার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন টিম লিডার।

আমরা যেখানে থেমেছি, সেটা একটি গ্রামীন বাজার। কুরমাছড়া বাজার (খুব সম্ভবত)। একপাশে কিছু জীর্ণ চেহারার দোকানঘর। অন্যপাশে নীচু ছাদের কয়েকটি একচালা। এই নিয়েই বাজার। বৃষ্টিতে আমরা ক'জন গাড়িতে। অন্যরা দোকানঘরের সামনের ভিটেয় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছি। এমন ঝুম বৃষ্টি! আকাশ ভেঙে নেমে আসবে যেনো। শ্রীমঙ্গলে বৃষ্টিপাতের হার সারা দেশে সবচে বেশি। তার ধরণ কেমন হয়, কিছুটা দেখার সুযোগ হয়ে যাচ্ছে এই যাত্রায়।

ছোট্ট হোটেলে অবসর মানুষের আড্ডা জমেছে। চুলায় ভাজা হচ্ছে পেয়াজু আর বেগুনি। একদিকে বৃষ্টির শীতল ধারা অন্যদিকে গরম তেলের আঁচ। বৈপরীত্য আমাদের চারপাশের সবকিছুতে মিশে আছে। রাস্তার পাশে একটি পুরোনো মন্দির দাঁড়িয়ে ভিজছে তারচে বহুপুরনো বৃষ্টির ধারাজলে। আমি দেখছি সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে বৃষ্টির

জল মিশে তৈরী জলের নকশার রূপ। এই মন্দিরে প্রথম যে পুরোহিত পূজাপাঠে এসেছিলেন, তখন কি এমন বৃষ্টি হতো? এই বাজার তখন ছিলো না। আশেপাশে জনমানুষের উপস্থিতি ছিলো না বললেই চলে। বৃষ্টির দিনের একাকী সন্ধ্যাগুলো তার কেমন কাটতো? বৃষ্টি তখনো ঝরতো অঝোরে। এখনো ঝরছে। কিন্তু, প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা হয় না।

কিছুক্ষণ পর আমাদের অন্য গাড়ি চলে আসায় আমরা আবার রওনা হলাম। ছোট্ট জিপ মানুষ পরিবহনের জন্য উপযুক্ত হলেও বৃষ্টি প্রতিরোধে বেকার। ভিজে নেয়ে চলতে লাগলো আমাদের দু'টি গাড়ির ক্যারাভান। আমি বাইরে তাকিয়ে দেখছি বৃষ্টির আঁকিবুকি। ডাকাতির আশংকায় আমাদের গাড়ি অন্য আরেকটি নিরাপদ রাস্তা দিয়ে বের হয়ে মেইন রাস্তায় পড়লো। তারপর পিচের উপর দিয়ে কেবলই টায়ারের গড়িয়ে চলার একঘেয়ে শব্দ। সবাই চুপচাপ নিজের মতো সময় যাপন করছে। আসন্ন সফর শেষের বেদনা আমাদের আহত করছে কি!

এনার রোলার কোস্টার

শ্রীমঙ্গল শহরে এসে আমাদের প্রধান কাজ ছিলো ফেরার ব্যবস্থা করা। বৃষ্টির কারণে শিডিউলের অনেক পরে আমরা এসে পৌঁছেছি। তাই , টিকেট পাওয়া নিয়ে সংশয় আছে। কিছুক্ষণ চেষ্টাচরিত্রির পর এনার টিকেট পেলাম। বেশিরভাগ পেছনের দিকের সিট। নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা আধাভেজা পোশাক নিয়ে একজায়গায় বসলাম সবাই। কেউ বাড়ির জন্য চা পাতা আনতে গেলো। কেউ যাচ্ছে খেতে। আমি দেখছি আমার চারপাশ। সেদিন ভোরের শ্রীমঙ্গলের সাথে চারদিকে চকচকে আলোয় ভেসে যাওয়া শ্রীমঙ্গলের কোন মিল নেই। মনে হচ্ছিলো, একটুকরো শহর এখানে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। যে স্নিগ্ধতা কিংবা নীরবতা সেদিন আমাকে আপ্লুত করেছিলো, আজকে সেটা আর টের পাচ্ছি না। বরং, বিরক্ত লাগছিলো। শোয়াইব ভাইয়ের বদান্যতায় আমরা কয়েকজন পেটপুরে খেয়ে নিলাম পাশের এক হোটেল থেকে।

একটু পর বাস এলে চড়ে বসলাম সবাই। সামনে যে কয়টা সিট পাওয়া গিয়েছিলো সেগুলোতে মেয়ে সহযাত্রীরা আর পেছনের দিকে আমরা অন্যরা। বাস চলা শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা টের পেলাম, আমরা আসলে বাসের পরিবর্তে কন্ট্রোলহীন রোলার কোস্টারে উঠে পড়েছি। এমন বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলো, আমাদের মনে হচ্ছিলো আমরা উড়ে চলেছি। দমবন্ধ করে শক্ত হয়ে বসে ভাবছি, এতো দূরের পথ কীভাবে শেষ হবে! ভাবতে ভাবতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাই নি। যখন টের পেলাম তখন বনানী পার হচ্ছে এনার কোস্টার। এবং, আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের হাত-পা ঠিক জায়গাতেই আছে!

নগরীর জেড়ে উঠা ও প্যাভিলিয়নের ডাক

ভোর হবে হবে করছে। এমন সময় আমরা চিরচেনা ঢাকায় এসে পড়লাম। মনির ডেবরাকে নিয়ে নেমে গেলো। আমাদের ট্রিপের প্রথম ফেরত যাত্রী ওরা। তারপর মহাখালি টার্মিনালে কোস্টার থেকে মাটিতে নামলাম সবাই। তখনো পুরোপুরি আলো ফোঁটে নি। আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠছে আমাদের জাদুর শহর। চমৎকার ইনিংস শেষে প্যাভিলিয়নে ফেরার ডাক শুনছি সবাই। চা খাওয়া, সেলফি তোলা আর টুকটাক গল্পে শেষ সময়টুকুও ফুরিয়ে গেলো।

আমরা বিদায় নিলাম পরস্পরের কাছে। ফিরতে হবে আবার প্রতিদিনের জীবনে। যেখানে কলাবন পাড়া, খাসিয়াপুঞ্জি, সঞ্জয়দা, হামহাম ট্রেইল, হড়কাবান কিংবা পথভোলার কোন জায়গা নেই। দিনের পর দিন কেবলই বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। এই চেষ্টায় আমাদের প্রাণশক্তির কতোটা ক্ষয় হচ্ছে, প্রতিদিন আমরা কতোটুকু করে মৃত্যুবরণ করছি, সেখবর কে রাখে!

শ্রীমঙ্গলের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী নুপীলানের প্রতিবাদী গ্রামবাসী কিংবা এই অঞ্চলের মানুষের সংগ্রাম-আন্দোলনের কোন কথা, এখন আর কেউ মনে রাখে না বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতির মাঝে জন্মানো আদিবাসী শিশুটির ভবিষ্যত নামের কোন চ্যাপ্টার রাখার অধিকার নেই। তারপরও শ্রীমঙ্গল শতবছর ধরে আগের মতো বৃষ্টিতে ভিজে। এখনো এখানে বরজভরা পান হয়। এখনো সুগন্ধি চায়ের কাপে উঠে আসে ইতিহাসের ঘ্রাণ। আমার মতো কোন খুদে ইবনে বতুতা সন্ধান করে ফিরে শ্রীমঙ্গলের মাঙ্গলিক মুহুর্ত। হামহামের জ্যোৎস্না রাতগুলোতে এখনো হয়তো পরীরা জলকেলিতে মগ্ন হয়। হাজারো বছরের পুরোনো রাত এখনো আসে। ভালো হোক প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকা প্রকৃতির সন্তানদের।

ম্যাপে হামহাম, খরচ এবং যাতায়াত রুট

ঢাকা থেকে শ্রীমঙ্গল যেতে হবে। ঢাকা থেকে রেল ও সড়ক পথে শ্রীমঙ্গল যাওয়া যায়। ঢাকার কমলাপুর থেকে মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে যায় আন্তঃনগর ট্রেন পারাবত এক্সপ্রেস। দুপুর ২টায় প্রতিদিন ছাড়ে জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস। বুধবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন রাত ১০টায় ছাড়ে উপবন এক্সপ্রেস। ভাড়া ১১৫ টাকা থেকে ৭৬৫ টাকা। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে সোমবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল সোয়া ৮টায় ছাড়ে পাহাড়িকা এক্সপ্রেস। শনিবার ছাড়া প্রতিদিন রাত ৯টায় ছাড়ে উদয়ন এক্সপ্রেস। ভাড়া ১৪০ টাকা থেকে ৯৪৩ টাকা। ঢাকার সায়েদাবাদ, কমলাপুর, আরামবাগ থেকে হানিফ, শ্যামলী, মামুন, ইউনিক ইত্যাদি পরিবহনে অথবা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে সিলেটগামী ট্রেনে করে শ্রীমঙ্গল এসে নামতে হবে।

যদি রাতের গাড়ীতে আসেন তবে শ্রীমঙ্গল থেকে নাস্তা করে ৯ টার মধ্যে রওনা দিবেন। আর যদি দিনের গাড়ীতে রওনা হন তবে রাতে হোটেলে থেকে ভোরে হামহাম চলে যাবেন এবং পথে কুড়মা বাজারে নাস্তা সেরে নিবেন। শ্রীমঙ্গল হোটেলের আশেপাশে অনেক সিন.এন.জি পাবেন, আপনাকে শ্রীমঙ্গল থেকে যেতে হবে কলাবন পাড়া, ওদের হামহাম যাব বললেই হবে। আপ ডাউন ১৫০০ টাকার মতো নিবে। কলাবন পাড়া পৌছে ওখানে চা শ্রমিক রাই গাইড হিসেবে যায়, ২০০/৩০০ টাকা নিবে গাউড। গহীন এবং পাহাড়ি বনের ভেতরে প্রায় আড়াই ঘন্টা হাটতে হবে, বনের প্রায় সাড়ে ৭ কিলো ভেতরে হাম হাম।

খাওয়া আপনার মন মতো খেতে পারেন। কলাবন পাড়ায় খেতে হলে আগে বলে যেতে হবে। প্রচলিত অর্থে ভালো মানের কোন হোটেল নেই এখানে। স্থানীয়রা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় খাবারের ব্যবস্থা করে থাকে। জনপ্রতি ১০০-১২০ টাকার মধ্যে মোটামুটি মানের খাওয়া হয়ে যাবে। শ্রীমঙ্গল শহরে খাবারের দাম ঢাকার মতোই। ভালো মানের রেস্টুরেন্ট এবং আবাসিক হোটেল আছে এখানে।

টিম মেম্বার

ক্রমিক	নাম	দায়িত্ব
০১	ফয়সাল মোহাম্মদ শান	টিম লিডার
০২	মোহাম্মদ মনির	সহঃ টিম লিডার
০৩	শোয়াইব রহমান	ট্রেকার
০৪	নিয়াজ মোরশেদ	ট্রেকার
০৫	হুমায়রা গুলশান	ট্রেকার
০৬	নীরব মাহমুদ	ট্রেকার
০৭	সন্দীপ রায়	ট্রেকার
০৮	তাহমিনা সুলতানা ছন্দা	ট্রেকার
০৯	রাহাত তাজওয়ার	ট্রেকার
১০	মৌসুমী চৌধুরী	ট্রেকার
১১	মনন মুনতাকা	ট্রেকার
১২	জুবায়েদ মিম্মো	ট্রেকার
১৩	ডেবরাহ লুইক (আমেরিকা)	ট্রেকার
১৪	রবার্ট (ফ্রান্স)	ট্রেকার
১৫	মাহাদী হাসান মিথুন	ট্রেকার
১৬	মনজুরুল ইসলাম মাসুম	ট্রেকার
১৭	মিসেস মাসুম	ট্রেকার
১৮	এ.আর.সি আদনান	ট্রেকার
১৯	আদনান হোসেইন মামুন	ট্রেকার
২০	মিজানুর রহমান	ট্রেকার
২১	শাহেদ আহমেদ পলাশ	ট্রেকার

ছবি

কৃতজ্ঞতা ও পরিশিষ্ট

ক্রমিক	বিষয়	নাম
০১	ছবি কৃতজ্ঞতা	Altitude - outdoor activities
০২	ব্যক্তিগত স্পন্সর সহায়তা	ফয়সাল মোহাম্মদ শান
০৩	ম্যাপ ও তথ্য কৃতজ্ঞতা	গুগল ম্যাপ, ইন্টারনেট
০৪	সেদিনের ভিডিও - ১	https://goo.gl/phbN20
০৫	সেদিনের ভিডিও - ২	https://goo.gl/Bqo6R2
০৬		

এই জার্ণিটি সহজ একটি জার্ণি। আমাদের জন্য কঠিন হয়ে গিয়েছিলো ঝুম বৃষ্টি এবং হড়কাবানের জন্য। অভিজ্ঞতার স্বল্পতা হয়তো খুব সহজ ট্রিপকেও কঠিন মনে করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। টিমের সাইজ আরেকটু ছোট হলে হয়তো কিছুটা সহজ হতো। ক্লাইম্বিং বলতে ঝর্ণার দেয়ালে র্যা পলিং-জুমারিং বুঝানো উদ্দেশ্য। অন দ্যা স্পট নোট না রাখার কারণে খুব বেশি তথ্যের জোগান দেয়া সম্ভব হয় নি। খরচ, যাতায়াত, ইতিহাস ইত্যাদি কিছু তথ্য প্রস্তুতিপাঠের মাধ্যমে জানা থাকায় যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানের সাথে আপডেট করা হয় নি।

কোঅর্ডিনেট ও রেঞ্জ ইত্যাদি তথ্যে গুগলের সাহায্য নেয়া হয়েছে। টেকনিক্যালি এই রিপোর্টটিকে ট্রিপ রিপোর্ট না বলে বরং বিস্তারিত ভ্রমণ নোট বলা যেতে পারে। মোট সদস্য সংখ্যা ২৪ ছিলো। কিন্তু, স্মরণ না থাকার কারণে ৩ জনের নাম বাদ রইলো। আমাদের একজন সহযাত্রী ঢাকা থেকে কলাবনপাড়া , সাইকেলে গিয়ে তারপর সেখান থেকে ট্রেকিং করেছেন। সাহসিকতার কাজ ছিলো। টিমলিস্টের নামের তালিকা র্যা ন্ডমলি করা হয়েছে। বিশেষ কোন কারণে নাম আগে-পরে করা হয় নি।

তথ্যের ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। থাকতে পারে ভাবনার অতিরঞ্জন। সকল অসঙ্গতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থি। কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হলে জানানোর অনুরোধ রইলো। সর্বশেষ কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার প্রতি, সকল কিছুর জন্য। ভ্রমণ হোক ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের একটি মাধ্যম।